টমাস হেনরি হাক্সলি

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

, ছিলেন ইংরাজ জীববিজ্ঞানী, জীবাশ্মবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, এগনস্টিসিজম (অজ্ঞেয়বাদ, বস্তুজগতের বাইরে ঈশ্বর বা পরম কে ানো কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়) নামক দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠাতা।

হাক্সলি শিক্ষিত পরিবারের সন্তান এবং তাঁর পরিবার কোনোদিন গরিব না হলেও সচ্ছল ছিল না। হাক্সলির ছেলেবেল ার কথা খুব বেশি কিছু জানা যায় না। শুধু কয়েকটি বিষয় তাঁর স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে। যেমন তাঁর দু'বছরের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত খারাপ, তাঁর মা তাকে সমস্ত দিক থেকে গড়ে তুলেছিলেন, ১২ বছর বয়সে তিনি জার্মান ভাষা শিখেছেন এবং তিনি ভূবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর খুব ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তিনি তা পড়ার সুযোগ পাননি। তবে বিজ্ঞানের ছোটখাটো পরীক্ষণে তিনি ছেলেবেলা থেকে আগ্রহী ছিলেন। যাই হোক, ১৫ বছর বয়সে তিনি একজন চিকিৎসকের কাছে (সম্পর্কেতাঁরদিদির বর) শিক্ষানবিসি থাকার জন্য নিযুক্ত হন। সেখান থেকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আগ্রহী হন ও জলপানি পান এবং ছাত্রাবস্থাতেই একটি গবেষণ াপত্র প্রকাশ করেন।

২১ বছর বয়সে তাঁর জলপানির মেয়াদ শেষ হয়, অথচ তখনও তিনি স্নাতক হননি। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই তিনি 'ব্য াটেলস্নেক' নামক একটি জাহাজে সরকারী সার্জেনের পদ পেয়ে যান। এর পরের চার বছর তিনি জাহাজে ঘুরে বেড়ান। তবে যে স্থানে জাহাজ নোঙর করে, সেখানে তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের বিষয়ে জ্ঞান আহরণ শু করে দেন।

এইরকম প্রতিটি বন্দর থেকে তিনি যথেষ্ট সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তা নিয়ে গবেষণাপত্র লিখে ফেলেন। এই প্রাণীদের সম্পর্কে তিনি রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল ইনস্টিটিউটের পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। এইসব লেখা সেই সময়েরপুরোধা জীববিজ্ঞানীরা সাদরে গ্রহণ করেন। তাই ১৮৫০ সালে যখন তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে অ াসেন তখন তাঁকে রয়েল সোসাইটির সদস্য করে নিতে অসুবিধা হয়নি। যদিও তখন তাঁর বয়স রয়েল সোসাইটির সদস্য হবার পক্ষে যথেষ্ট কম ছিল।

এই সময় হাক্সলি রয়েল নৌবাহিনী থেকে তাঁর গবেষণার কাজের জন্য তিন বছর সবেতন ছুটি আদায় করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই তিন বছর গবেষণা করে অন্তত একটা ডিগ্রি তিনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু ২৬ বছর বয়সে রয়েল সোস াইটির সদস্য হবার পর ঐ ডিগ্রি অর্জন করার আগ্রহ তাঁর চলে যায়। শুধুমাত্র তাঁর জীবনে ডিগ্রি বলতে সম্বল ছিল পশ্চি ম ইউরোপের অন্তত আটটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিগুলি।

অবশ্য এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রাণীদের দেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান কী, জীবাশ্মবিদ্যার পদ্ধতিতন্ত্র কী হওয়া উচিত, বিজ্ঞান - শিক্ষা কেমন করে দেওয়া যেতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া কী ভাবে হয়, মেদণ্ডী প্রাণীর করোটির গঠন কেমন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য চমৎকার লেখা লেখেন।

১৮৫৪ সালে তাঁকে নৌবাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তলব করা হয়; কিন্তু গবেষণার কাজ শেষ হয়নি, এই অজুহ

াতে তিনি আরও ছুটি চান। তখন তাকে নৌবাহিনী থেকে ছাঁটাই করা হয়। এই সময় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এবং সেখানে তিনি হেনরিয়েটা নাম্নী কে মহিলার প্রেমে পড়েন। তঁকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় থেকে যাবেন এমন সিদ্ধান্ত তখন প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য চাকরির সুব্যবস্থা তখন অস্ট্রেলিয়ায় তেমন ছিল না। তাই তাঁকে সিদ্ধান্ত তখন পাল্ট াতে হয়।

ততদিনে তিনি লন্ডনের সরকারি মাইনস স্কুলে প্রথমে আংশি ক সময়ের জন্য এবং পরে পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। এছাড়া তাঁর লেখার হাতও ছিল অসম্ভব ভালো, সেই সময় লিখেও তিনি যথেষ্ট রোজগার করেন। ১৮৫৫ সালে হেনরিয়েটা লন্ডনে আসেন এবং হাক্সলির শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। পরবর্তী জীবনে অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, এডিনবরা এবং অন্য আরও ৰিবিদ্যালয় থেকে অনেক লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব তাঁর কাছে এলেও তিনি তাঁই এই মাইনস স্কুল ছেড়ে কোথাও যাননি। এই স্কুলকে তিনি শেষ পর্যন্ত গ্রেট রয়েল কলেজ অব সায়েন্স -এ রূপান্তরিত করেন।

বিবাহিত জীবনে হাক্সলি অত্যন্ত সুখী মানুষ ছিলেন। তাঁর আটটি সন্তান ছিল, এর মধ্যে শুধু প্রথম সন্তান নোয়েল শৈশব াবস্থায় মারা যায়। তাছাড়া প্রতিটি সন্তান বিজ্ঞান বা শিল্পকলায় অত্যন্ত কৃতী মানুষ হয়েছিলেন।

১৯৮৫ সালে ডারউইনের অরিজিন ... লেখা বই হিসাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে হাক্সলির অবদান ছিলে অনেকখানি। তবু তিনি ডারউইনের এই তত্ত্বের ব্যাপারে তাঁকে একটি সবাধানবাণী দিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ রূপে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। ডারউইন তাঁর অভিব্যক্তির তত্ত্বে বলেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির রূপান্তর ঘটে থাকে সর্বদা ধীরলয়ে। এই ধারণাটি ডারউনিনের মাথায় ঢুকেছিল তাঁর ভূমিজ্ঞানের শিক্ষক লায়েলের শিক্ষা থেকে। এই ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়ে হাক্সলি তাঁকে একটি চিঠিতে লেখেন, "...কেন যে আপনি শুধুমাত্র ঐ 'ধীরলয়ে রূপান্তরের' বিষয়টিতে জেদ ধরে বসে আছেন, তা আমার কাছে এখনও বোধগম্য নয়। আমার তো মনে হয়, জীবের অভিব্যক্তিতে মাঝে মাঝে উল্লম্ফনও ঘটে।"

পরবর্তীকালে জীবাশ্মবিজ্ঞানী গুল্ড এবং এলরিজ আবিষ্কার করেন যে, প্রাণিজগতে পর্বের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় মাঝে কিছু পর্য ায়ে, এমনকি জিনগত পরিবর্তন যথেষ্ট জমা হলেও প্রাণীদের গুণগত কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। পর্বের এই পর্যায়কে তাঁরা নাম দেন stasis phase। আর এরপর কোনো উল্লম্ফনের মধ্যে দিয়ে প্রাণীদের পর্বান্তর ঘটে থাকে, যাকে তাঁরা বললেন Punctuated Equilibrium.

হাক্সলির সঙ্গে আরও যে দু'জন বিজ্ঞানী, ডারউইন ও আলফ্রেডকে একত্রে প্রতিষ্ঠত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, তাঁরা হলেন চার্লস লায়েল ও নাইট হুকার। যাই হোক, পরবর্তীকালে প্রকাশিত ডারউইনের অরিজিন ... বই সেই সময়ে শুধু জীববিজ্ঞান নয়, সাধারণভাবে সামাজিক জীবন বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে। এই সময় থেকে হাক্সলি হয়ে ওঠেন ডারউইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ডারউইনেরথেকে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তবু সাধারণভাবে দেখা যেত, ডারউইন সব সময় লে াকচক্ষুর আড়ালে থাকতেন; কিন্তু জনসমক্ষে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাক্সলি উঠে পড়ে লেগে রয়েছেন। এ ব্যাপারে বিখ্যাত হয়ে আছেন বিশপ উইলবারফোর্সের সঙ্গে তাঁর ১৮৬০ সালের বিতর্কটি। বিষয়টি কতখানি গুত্বপূর্ণ ছিল তা আমরা এখন অনুমানও করতে পারব না। কারণ এই ঘটনাকে বিচার করা হয় পাশ্চাত্য সমাজে বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের স্থায়ী বিচ্ছেদের বাঁক হিসাবে।

যাই হোক, ১৮৬০ সাল থেকে হাক্সলি, জীবাশ্মবিদ্যা, প্রাণী - প্রশিক্ষণবিদ্যা, প্রণালীকরণবিদ্যা (পাখিদের শ্রেণীবিভাগ) ইত্যাদির ওপর অনেক গবেষণা করেন। তিনি লন্ডনের ভূমিজ্ঞান সমিতির প্রথমে সচিব ও পরে সভাপতি হন। তিনি রয়্যাল কলেজ অব সার্জেনদের হান্টেরিয়ান প্রোফেসর হন। অনেক কয়েকটি রয়েল কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসাবে তিনি কাজ করেন বেং এথনোলজিক্যালসোসাইটির সভাপতিও নির্বাচিত হন। তিনি দক্ষিণ লন্ডনের ওয়ার্কিংম্যানস কলেজের সম্ম ানীয় অধ্যক্ষের পদও অলংকৃত করেন। এছাড়া সারা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য অসংখ্য আলোচনাসভায় বক্তা হিসাবে যোগ দেন। এই সঙ্গে মনেরাখতে হবে শ্রমজীবী মানুষদের তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং তাঁর কোথাও তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ছুটে যেতেন।

১৮৭০ সাল নাগাদ তিনি লন্ডনের স্কুল বোর্ডের একজন ক্ষমতাশালী সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। এইবার তিনি তাঁর ভাবনা চিন্তাকেযথোপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। সেই সময় লক্ষ্য করা যায়, একদিকে পত্র - পত্রিকায় নানা

লেখার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা কী হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত জানিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে নিজে আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে বা অন্য সভ্যদের প্রভাবিত করে তিনি ব্রিট্রেনে এক আধুনিক বুনিয়াদি শিক্ষাক্রম চালু করতে উঠেপড়ে লেগে আছেন এবং পরিশেষে সমর্থ হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল পরবর্তী ৭৫ বছর ব্রিটেনে ঐ শিক্ষাক্রম, শুধু বুনিয়াদি স্তরে নয় উচচশিক্ষা ব্যবস্থাতেও চালু রইল। এমনকি এখনও প্রযুক্তির বিপ্লবের কালে ব্রিটেনের যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তাতে হাক্সলির অবদান ও প্রভাব যথেষ্ট।

এই পর্যায়ে তিনি এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নবম মুদ্রণে অনেকগুলি রচনা লেখেন, বিজ্ঞানের বিষয়ে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকরচনা করেন। বিজ্ঞানশিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি রয়েল সোসাইটির প্রথমে সচিব ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং লন্ডন ব্বিবিদ্যালয়ের সেনেটার হন। এই সময়ে জনস্ হপ্কিনস্ ব্বিবিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি অমেরিকা যান এবং ঘোড়ার অভিব্যক্তি নিয়ে চমৎকার বক্তব্য রাখেন।

তিনি স্কটল্যান্ডের এবারডেন সংশোধনাগার ব্বিবিদ্যালয়ের রেকটার নির্বাচিত হন। এছাড়া ওয়ার্কিং ম্যানস ক্লাব এবং তাঁদের ইনস্টিটিউট ইউনিয়ন গড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। এটন কলেজের গভর্নর হয়ে সেখানে কেমন করে বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি করা যায়, এ বিষয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেন। এছাড়া লন্ডনের বিত্তবান মানুষদের কাছে তিনি আবেদন জানান, তাঁরা যেন দেশের প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নতির প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করেন। মনে রাখতে হবে, এত কাজের মাঝে তিনি মাইনস স্কুলে পূর্ণ সময়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত থেকে ছেলে পড়াচেছন এবং নিজেদের গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচেছন।

১৯৭৮ সালে মূল গ্রীক ভাষায় অরিস্ততলের দর্শন পড়ার কথা তাঁর মনে হয় এবং তিনি গ্রীক ভাষা শিখতে শু করেন। ইতোমধ্যে তিনি ফরাসি, জার্মান, ইতালি, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন। এইবার দর্শনে তাঁর আগ্রহ গভীর হয় এবং দেকার্ত, বার্কলি, হিউম প্রমুখের ওপর তিনি চমৎকার কতকগুলি লেখা লেখেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বের ওপর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং নিজের অবস্থানটি বোঝাতে তিনি 'অজ্ঞেয়বাদী' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৮৮৫ সালে হাক্সলির মনে হয়, তাঁর এবার সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেননা। এই পরিকল্পনা করে তিনি ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে শু করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সরে আসতে থাকেন। কিন্তু তিনি যে তখনও কতখানি 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' -- এ তেজি মানুষ, মাঝে মাঝেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশেষে এর চার বছর পর সত্যই তিনি লন্ডন ছেড়ে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে এক নির্জন গ্রামে চলে যান। ঐস্থানে বাস করেওতিনি লেখালেখির মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেন। অবশেষে ১৮৯৫ সালের ২৯ শে জুন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁরই লেখার প্রুফ দেখতে দেখতে তিনি মারা যান। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে, উত্তর লন্ডনে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

হাক্সলি, সারা পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষজনের কাছে নমস্য ব্যক্তি। নিজের দেশে তিনি সম্মান, খ্যাতি যাই পেয়ে থাকুন দেশের সীমানার বাইরে তিনি অন্তত ৫৩টি দেশের বিজ্ঞান - সমাজের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। এই দেশগুলি হল ঈজিপ্ট, রাশিয়া, সুইডেন, ইতালি, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, বেলজিয়াম, হল্যান্ডইত্যাদি।

যদিও তাঁর থেকে অনেক বড় মাপের অনেক বিজ্ঞানী তাঁর সময়ে জন্মেছেন; কিন্তু তাঁর মতো কোনো একজন মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশের তথা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতিকল্পে বা সার্বিকভাবে জাতির জনমানসে যুক্তিবিচারবোধের ধারা গড়ে তোলার জন্য এই পরিমাণ কাজ করতে পারেননি বা এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি -- এ কথা তাঁর শত্রুরাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। এই বিচারে বলা যেতে পারে, পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাক্সলি ছিলেন তাঁর প্রজন্মে এবং পরবর্তী আরও অনেক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

তাঁর ভাবনাচিন্তার প্রভাব শুধু তাঁর সময়ে নয়, তাঁর পরবর্তী বহু প্রজন্মের মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং আজও করে চলেছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে হাক্সলির একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে বিজ্ঞান গড়ে তোলার জন্য ১৮৮৭ সালে ইম্পিরিয়ল ইনস্টিটিউট নামক একটি অগ্রগামী সংগঠন প্রস্তুত কর

া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান - প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য আটটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে এর প্রস্তুতি হিসাবে লন্ডনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টি জনপ্রিয় করার জন্য ১৮৮৬ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। যদিও এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত আরও মজবুত করা। যাই হোক, এইসংগঠনের সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলি মানুষের ক াছে পৌঁছাবে এই ধরনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে হাক্সলি বড়ন্দ্ব বনপ্পন্দ্বন্দ্ব পত্রিকায় ১৮৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারি বিজ্ঞ ান ও শিল্প - প্রযুক্তির মেলবন্ধনকে সামনে রেখে একটি লেখা লেখেন, “আমি চোখের সামনে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি যেদিন বিজ্ঞান - প্রযুক্তির অগ্রগতিকে ভালোবেসে এই ইম্পিরিয়ল ইনস্টিটিউট নামক সংগঠনটির ছাতার তলায় সব ধরনের মানুষ যেমন পুঁজিপতি, কারিগর প্রমুখ সবাই মিলিত হতে পারবেন। এটা হবে তাঁদের মিলনক্ষেত্র যেখান থেকে তঁ ারা আরও উন্নত পর্যায়ের শিল্প - বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ের গুতর প্রগুলিকে সমাধানের জন্য উপযুক্ত ও যথায়থভাবে চর্চা করতে পারবেন, পরস্পর মতামত বিনিময় করতে পারবেন। এরই সঙ্গে এক একটি শিল্প - বাণিজ্যের ঋবিদ্যালয় তৈরি হবে যেখান থেকে প্রথাগতভাবে সারা দেশের মেধাবী সন্তানদের চমৎকার কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে।”

অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)

এই কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ ‘agnostos’ থেকে। এর অর্থ, যা জানা সম্ভব নয়। এই কথাটির মধ্যে দিয়ে আমরা বোঝাতে চাই, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া আমরা অন্য আর কিছু জানতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানে এই কথাটি ব্যবহার করা হয় সংশয়বাদের (Scepticism) সমার্থক হিসাবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টধর্মের অন্ধঋাসের বিদ্ধে একে দাঁড় করানো হয়।

১৮৯৬ সাল নাগাদ হাক্সলি লন্ডনের মেটাফিসিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে এ সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণে বলেছেন, “এই শব্দটা আমার মাথায় এল চার্চের ইতিহাসে ব্যবহৃত হওয়া Gnostic শব্দটির ঠিক বিপরীত শব্দ হিসাবে। যেখানে তাঁরা দাবি করেছেন, ঐ ঈশ্বরের ঋাসের ব্যাপ ারটিতে তাঁরা সবই জানেন, বোঝেন। তখন আমার মনে হল, তাহলে বলতে হবে এ ব্যাপারে অমি অজ্ঞ।”

এরপর হাক্সলি তাঁর লেখাপত্রে এই শব্দটি ত্রমাগত ব্যবহার করেন। তখন থেকে এই শব্দটি চালু হয়ে যায়। তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টধর্মের ঐতিহ্যানুসারে ঈশ্বরঋাসের বিদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু তিনি এর পরিবর্তে বা এর বিপরীতে ঈশ্বর ঋাসের বিষয়টিকে মুলতুবি রাখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে কি নেই, এই বিতর্ক তাঁর ক াজের বিষয় নয়, তাই তিনি এটি এড়িয়ে যেতে চান।

পরবর্তীকালে যেভাবে এই শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং সাধারণ কথাবার্তায় এটি ব্যবহার করা হয়, তাতে বোঝা যায়, এতে দুটি বিষয় অন্তঃসম্পর্কিত; কিন্তু এক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। যেমন কোনো একটি বিষয় চরমভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কারণ তার জন্য যে সমস্ত প্রমাণাদি প্রয়োজন তা কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে ঈশ্বরের বিষয়েও এই প্রব্লর প্রসঙ্গটি আমরা তুলতে পারি। অঋাস বা সন্দেহ, ঈশ্বরঋাসীদের মনেও থাকে; কিন্তু তা তাদের ঈশ্বরঋাসে কোথাও বাধার সৃষ্টি করে না। পরিবর্তে এই ধরনের সন্দেহ বা অঋাস যেমন, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী, এই কথা বুঝতে সাহায্য করে, যার ওপর ভিত্তি করে ধর্মের নতুন টীকা - ভাষ্য তৈরি হয়।

কিন্তু হাক্সলি যেভাবে ‘অজ্ঞেয়বাদ’ কথাটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে এই কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে ধর্মের নতুন টীকা - ভাষ্য বোঝাতে চাইছেন না। বিশেষত মানব ও ঈশ্বরের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি তিনি র াজনৈতিক টীকা - ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। যেমন তিনি বলতে চান, জগতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা অনেক কিছুই দেখবেন বলে আশা করেন; কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। সুতরাং তখন প্র্ল এসে যায় তাহলে কী কোনো জগৎপ্রভুর ইচ্ছায় এই ঘটনাগুলি ঘটছে না কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঘটনাগুলি ঘটছে? আর তারপরই প্র্ল উঠবে, তাহলে কে এই জগৎ - সংসার পরিচালনা করে?

বাস্তবিক এই প্র্লটি হাক্সলিকে সামনে আনতে হয়েছিল ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সর্বসমক্ষে প্রমাণ ও প্রচার করার

জন্য। এর জন্য হাক্সলি ও তাঁর কমরেডদের কম লড়াই করতে হয়নি। কারণ তখন যাঁরা ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্বকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন এবং প্রচার করতে চাইলেন, তাঁদের এ ব্যাপারে দার্শনিক দিক থেকে ক্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করতে হল। কারণ জীবনবিজ্ঞানে তখন ক্রিয়েশনিজমই একমাত্র ভাবধারা হিসাবে চালু ছিল। এই বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা স্বাভাবিক কারণে অজ্ঞেয়বাদীরা এসে পৌঁছলেন। তাই তাঁর স্বাভাবিকভাবে হয়ে উঠলেন খ্রিস্টধর্মে অবিশ্বাসী ও তার বিরোধী! এখানে ধর্মাবলম্বীদের সুবিধাহলযে, 'ধর্মবিরোধী' এই ছাপ তাঁরা দিতে পারলেন। অথচ খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতা করা এই অজ্ঞেয়বাদীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্যাপারটি বিচার করলে এইরকম দাঁড়ায়। ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্বকে যাঁরা মানছেন তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করতে বাধ্যহচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চার্চেরও বিরোধী হয়ে পড়ছেন। তখন তাঁদের একটি ধর্মীয় - দার্শনিক অবস্থান বেছে নিতে হচ্ছে। এই অবস্থানটি তৈরি করার ক্ষেত্রে, 'অজ্ঞেয়বাদ' ঐ সময় গুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐ সময়ে বহু বিজ্ঞ ানী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও পণ্ডিত মানুষজন এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এখানে যেমন গোঁড়া বেদের হিন্দুত্বকে অস্বীকার করতে চেয়ে ব্রাহ্মধর্মের (অক্ষয় দত্ত?) উত্থান ঘটেছিল। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর নিজের ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে য া বলতেন তাতে তাঁকেও 'অজ্ঞেয়বাদী' আখ্যা দেওয়া যায়।

ইংল্যান্ডে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অজ্ঞেয়বাদের লড়াই আর শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মের বিদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। এই লড়াই আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। কারণ খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসকে যাচাই করা বা ত ার সমস্ত মতামতকে তথ্য - প্রমাণাদি সহ যাচাই করার ক্ষেত্রটিতে। পরবর্তীকালে দেখা গেল, ন্যায় - প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) যার সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, কতগুলি বিষয়ে যেমন চরম সত্য কী এবং তা কখনই জানা যাবে না, ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার ক্ষেত্রে, অজ্ঞেয়বাদকে পিছনে ফেলে সামনে চলে এসেছে। এ ব্যাপ ারে ব্রিটিশ দর্শনের ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদের (empiricism) ধারার সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের উৎপত্তি ও বিকাশের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

অজ্ঞেয়বাদ সম্পর্কে হাক্সলির মতামত থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একটি হল, কোনো বিষয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ইত্যাদিসম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই জানা বা না জানার সম্পর্কসূত্রে ধর্মমতের অবস্থান। কিন্তু শব্দার্থ বিচার করলে অজ্ঞেয়বাদকে এতদূর বিস্তৃত করা যায় না। যাই হোক, লেনিন তাঁর materialism and Empirio – Criticism (1908) গ্রন্থে দর্শনের দুটি চরম অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি একদিকে যথার্থ বস্তুবাদের চরম অবস্থান কী হতে পারে তা বলেছেন, তেমনি বার্কলির ভাববাদের চরম অবস্থানও দেখিয়েছেন। এই বিষয়টি আলোচনা করতে চেয়ে তিনি অজ্ঞেয়বাদকে বলেছেন, হিউমের সংশয়বাদ আর কান্টের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেরর মাঝামাঝি একটি অবস্থান (halfway house)। অজ্ঞেয়বাদ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, প্রকৃতিকে কখনই সম্পূর্ণরূপে জানা যাবে না। একথা কান্টের ' things - in- themselves 'ভাবনাকেই সমর্থন করে।

হাক্সলির অধর্মীয় অজ্ঞেয়বাদ ঃ হাক্সলি যে অজ্ঞেয়বাদের কথা বলছেন তার মধ্যে একটা কর্তৃত্বপরায়ণতার ব্যাপার অ াছে। অর্থাৎ তিনিএই নানা জানাকে 'গৌরবান্বিত' করছেন না বা এখন কথা বলছেন না যে যেহেতু কোনো কিছু ঠিকমতো জানা যাবে না, সুতরাং জানারচেষ্টা বৃথা। উল্টে তিনি জানাচেছন, এটা কোনো ধর্মীয় কৃত্য নয়, এটি একটি পদ্ধতিতন্ত্র। য াতে যুক্তি - বুদ্ধি প্রয়োগ করে জানার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হবে এবং যতদূর জানা সম্ভব তার চেষ্টা করা হবে। তারপর যতটুকু জানা গেল তা স্বীকার করে নিতে হবে এবং সততার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে এইটুকুই আমার জ্ঞানের সীমা; কিন্তু এর জন্য আমার কোনো অগৌরব নেই।

আশর্চ্য হলেও সত্যি যে ঠিক এই কথাই আমরা বলতে শুনেছি, ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানদার্শনিক ক্লিফোর্ডকে তাঁর 'The Ethics of Belief (1876)' শীর্ষক রচনাটিতে। তিনি বলছেন, উপযুক্ত তথ্য - প্রমাণাদি ছাড়া কোনো কিছু বিশ্বাস করা একেবারে ঠিক নয়। যাই হোক,পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞানী বার্নাল তাঁর নিজের বিজ্ঞানদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে ভ াবধারার প্রবর্তন করেন তাকে তিনি বলেন Provisionalism। যদিও তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু লিখে যাননি, তবু অ ামাদের মনে হয় এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী বার্নাল, হাক্সলিরসার্থক উত্তরসূরি ছিলেন।

হাক্সলির ঠাকুমা

ইউরোপে বহুকাল পূর্বে যখন কল্পনায় অ্যাডভেঞ্চার করার তুলনায় বাস্তবে করে দেখানোর স্পৃহা বজায় ছিল, তখন সে কালের যুবকরা নানা পেশা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতেন এবং কালক্রমে প্রকৃতিবিদ্ হয়ে উঠতেন। যেমনটি ঘটেছিল ডারউইনের ক্ষেত্রে, যিনি ১৮৩১-৩৬ সালে বিগল জাহাজে, ক্যাপ্টেনের সখা হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন এবং কালক্রমে প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠেছিলেন। আবার ডারউইনের থেকে প্রায় ষোলো বছরের ছোট হাক্সলি, হয়তো ডারউইনকে ঈর্ষান্বিত করে, র‍্যাটেলস্নেক নামক একটি জাহাজে ১৮৪৬-৫০ সালে, প্রধানত অস্ট্রেলিয়ার আশেপাশের সমুদ্রে ভেসে বেড়ান।

হাক্সলি ১৮৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বোনকে নেটি সম্পর্কে লিখছেন, "এত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে আমি আগে কখনো দেখেনি। ও মানুষকে খুব ভালোবাসতে পারে এবং প্রয়োজনে সব ত্যাগ করতে পারে।" নেটির একমাত্র যে ত্রুটি হালের চোখে পড়েছিল তাহল, একজন বিত্তবান ঘরের মেয়ে হয়ে হালের মতো এমন একজন ছন্নছাড়া মানুষের হাতে ও অর্বাচীনের মতো নিজের সুখ-দুঃখ সব সঁপে দিতে চাইছে। ১৮৫০ সালে হল, অস্ট্রেলিয়া থেকে লন্ডনে ফিরে যান এবং প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পর নেটি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর লন্ডনে তাঁদের শুভ পরিণয় হয়, তখন হাল একজন নামকরা সার্জেন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী হয়ে উঠছেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন সমস্ত দিক থেকে সফল ছিল। তাঁদের সাতটি সন্তান হয়। এর মধ্যে বড় ছেলে নোয়েল অল্প বয়সে মারা যায়। এছাড়া প্রতিটি সন্তান ছিলেন কৃতী।

হাক্সলি মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী উনিশ বছর বেঁচেছিলেন। হাক্সলি জার্মান, ইতালি ইত্যাদি অনেক কটি ভাষা শিখেছিলেন। ১৮৫০ সালে যখন হাক্সলি অস্ট্রেলিয়া থেকে লন্ডনে পাড়ি দেন তখন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ও বিদায়কালটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রেমিকা নেটি তাঁকে বিখ্যাত ইতালি কবি তাসোর পাঁচ খণ্ডের Gerusalemme Liberata উপহার দেন। এই অপূর্ব মহাকাব্যে আছেন জেসালেম জয়ের প্রথম ধর্মযুদ্ধের কাহিনী। যাই হোক, এরপর নেটি লন্ডনে এসে হালকেবিয়ে করে তাঁর সংসার গড়ে তুলেছেন। এতগুলি ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন এবং মানুষ করেছেন; কিন্তু তার থেকেও বড় কথা পৃথিবীতে বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর কোনো একটি মানুষ যদি সব থেকে বেশি কাজ করে থাকেন, তিনি হলেন টমাস হেনরি হাক্সলি।সুতরাং কল্পনা করতে কষ্ট হয় না, এই মানুষটি কতটুকু সংসারে সময় দিতেন!

কিন্তু হাক্সলি যে কাজ করে গেছেন বা করতে চেয়েছেন তার ধারাবাহিকতা তাঁর সন্তান - সন্ততিদের মধ্যে রক্ষিত হয়েছিল। এই সম্পর্কসূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, টমাস হাক্সলির নাতি প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি। ঠাকুমা দেখলেন এই জুলিয়ান, বীর বিক্রমে দাদুর পতাকা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত এই কথা মনে রেখে, তাঁর ঠাকুমা ৬০ বছর পর ঐ তাসোর বই ঘরের শেল্ফ থেকে নামিয়ে, ধুলো ঝোড়ে ১৯১১ সালে ২৮শে জুলাই জুলিয়ানের জন্মদিনে উপহার দিলেন এবং লিখেদিলেন "তোমার ঠাকুরদাকে আমি এই বই দিয়েছিলাম।"

৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয় ব্যাকটেরিযার মাধ্যমে এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যে এই বিকাশ থেমে থাকেনি। এখন আমরা জানি, এই প্রাণের বিকাশ এক ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কারণ জানা গেছে প্রাণীকোষের উপাদানগুলি যেমন মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজম সব এক একটি ব্যাকটেরিযা। এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে মানুষ এসেছে কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে, যদিও আমাদের সভ্যতার বয়স বড় জোর পাঁচ হাজার বছর। কিন্তু এই পাঁচ হাজার বছরে হাক্সলির ঠাকুরদার ঠাকুমা এইভাবে সঞ্চিত মানবসম্পদ সরবরাহ করেছেন, জীবের বিবর্তনে জৈবিক উপাদানের মতো যুগ যুগ ধরে তাঁদেরসন্তান - সন্ততির মধ্যে দিয়ে। আর এটিকে বলা যায় মানব - প্রজাতির একটি অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা, জীবনচর্চার প্রক্রিয়া।

কমরেডের জন্য লড়াই

ডারউইনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রিটিশ সমাজে যে কয়েকটি লড়াই জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে তার মধ্যে একটি হল বিশপ উইলবারফোর্সের সঙ্গে হাক্সলি (হুকার?)-এর লড়াই। এ সম্পর্কে একটি মতামত প্রাধান্য পেলেও অসংখ্য ছোটখ

াটো অভিমত চালু আছে। অর্থাৎ যথার্থভাবে এই আলোচনাসভায় কী প্রকারের লড়াই হয়েছিল তার নিখুঁত বিবরণ, সাধারণভাবে যে মতগুলিআমরা দেখে থাকি, তার মধ্যে থেকে উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু কেন এমন লড়াই হয়েছিল? এর কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ঐ সময়ে ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় উদ্বেলিত ব্রিটেন সাম্রাজ্য ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে মুক্ত অর্থনীতি দেখতে পেয়েছিল (ব্রপ্ত উস্ত্রপ্প ত্রপ্পন্দ্ধড়)। তাই প্রচ্ছন্নভাবে ডারউইনের জীবনবিজ্ঞানের তত্ত্ব (ডারউইনিজম?) রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হয়। এই কারণে সংরক্ষণশীল চার্চের বিশপ উইলবারফোর্স এই আলোচনাসভায় মরিয়া হয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন, একথা অনেকের জানা থাকলেও, তা তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। তুলনায় হাক্সলিকেই বিজয়ীর শিরোপা দেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা এই ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটির পর যা জানাচ্ছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে রাখার চেষ্টা করছি।

আমরা জানি অরিজিন ...প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের নভেম্বরে এবং তখন থেকেই সমস্ত ব্রিটিশ সমাজে এ সম্পর্কে আলোড়ন শু হয়। সুতরাং সমসাময়িক কালের এই আলোড়নের অংশীদার হয়ে British Association for the Advancement of Science সংগঠনটি, অক্সফোর্ডের জীববিজ্ঞানের যাদুঘরের বড় হলে, ১৮৬০ সালের ৩০শে জুন, শনিবার ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্ব সমাজের ওপর কী ধরনের সামগ্রিক প্রভাব ফেলেছে এ ব্যাপারে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে।

এই আলোচনাসভায় প্রায় ৭০০ শ্রোতার সমাগম হয়েছিল, এটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং এর প্রারম্ভে এক ঘন্টার বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমেরিকার পণ্ডিত জীববিজ্ঞানী ড. ড্রাপার। তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় ছিল, Intellectual Development of Europe Considered with Reference to the Views of Mr. Darwin.

তিনি ছাড়া এই আলোচনাসভায় যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশপ উইলবারফোর্স টমাস হাক্সলি, নাইট হুকার (ডারইউনের বন্ধু ও প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ্) প্রমুখেরা। এই আলোচনাসভা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা সকলের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে তা এইরকম

১। ড্রাপারের প্রাথমিক বক্তব্যের পর মতামত দিতে উঠে বিশপ ইউলবারফোর্স অত্যন্ত তির্যক ও নিন্দাসূচক ভাষায় হাক্সলিকে আত্রমণ করেন এবং তাঁর কাছে জানতে চান, হাক্সলি পিতামহ বা পিতামহী কোনো দিক থেকে তাঁর পূর্বপুষ নরবানর ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন!

২। এর উত্তর দিতে উঠে হাক্সলি অত্যন্ত জোরালো, পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশপের প্রতিবাদ করে জানান যে কোনো সম্ভ্রান্ত পূর্বপূষের মিথ্যা বাগ্মিতার তুলনায়, তাঁর পূর্বপুষ ছিল নরবানর, এই পরিচয় দিতে তিনি মোটেই কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নন বা পরিবর্তে গর্ববোধ করেন।

৩. বিশপের মুখের ওপর এমন জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা তুমুল হর্ষধবনির মধ্যে দিয়ে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর শতাধিক বছর ত্রমাগতভাবে প্রচারের ফলে এই বিতর্ক সমগ্র বিশ্বে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের লড়াইয়ের দিকচিহ্ হিসাবে বিশেষ মনোযোগ ও গুত্ব লাভ করে এবং বলা হয় যে, এই সময় থেকেই ডারউইনের যুগ শু হয়ে যায়। সুতরাং যুক্তি বনাম অন্ধবিশ্বাসের বিচারে বা বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবিরোধিতার বিচারে এই আলোচনাসভাটিকে দিকচিহ্ হিসাবে ধরা উচিত এবং আরও বলা হয় যে, এই আলোচনায় ধর্মের ওপর শুধু হাক্সলি বা ডারউইনের জয় সূচিত হয়নি। এই জয় এই সময় থেকে বিজ্ঞানের যুক্তিবিচারবোধের জয় হিসাবে সূচিত হয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে যাই ঘটুক না কেন, খাঁটি বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, এই আলোচনাসভায় ঠিক কী ঘটেছিল তা খুঁজে দেখা। এ ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করতে পারি, ঐ আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন কেনন ফারার নামক এক উদারমনা ধর্মযাজক। তাঁর স্মৃতিচারণে তিনি ১৮৯৯ সালে হাক্সলির সন্তান লিওনার্দ হাক্সলিকে চিঠির আকারে লিখেছেন (যা পরে প্রকাশিত হয়)।

এই লেখায় ফারার বলছেন, "বিশপ উইলবারফোর্স আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল, কেউ যদি মাতা বা পিতার দিক থেকে নরবানরকে আপন পূর্বপুষ হিসাবে পরিচয় দিতে চান, তাহলে সেটা কী খুব ভালো শোনায়। তখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তোমার বাবা বলেন, এই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত অপমানজনক এবং কোনো ভদ্রসমাজে এমন মন্তব্য কেউ করবেন এটা আশা করা যায় না। এই কথা বলায় বিশপের লোকজনরাও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু এই বিশপ একজন চমৎকার বাগ্মী ছিলেন। আর সেদিনের সভায় বক্তৃতায় বিশপ প্রায় সকল মানুষের মন জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি বক্তৃতার শেষে ঐ ধরনের একটি মন্তব্য করায় উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতি ষ্ট হন। তাই সব মিলিয়ে আমার অভিমত হল, তোমার বাবারই জয় হয়েছিল; কিন্তু তা জোরালো বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তিনি যেভাবে নিজেকে সংযত রেখে ভদ্রতা, সভ্যতার সঙ্গে আচরণ করেছিলেন তাতে ঐ সভার সমস্ত মানুষ তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। অ ারও বলার কথা। হল, ঐ সভায় সম্ভ্রান্ত মানুষজনের মধ্যে একটি বড় অংশের উপস্থিতি ছিল মহিলাদের। সুতরাং বিশপের এই মন্তব্যে তাঁরাও যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশপের বক্তব্যের প্রতিবাদ যদি কেউ করে থ াকেন তাহলে তিনি হলেন নাইট হুকার।”

ফেরারের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, বাস্তবিক তাই ঘটেছিল। ড্রাপারের দীর্ঘ আলোচনার পর একে একে সব াই যখন বক্তব্য পেশ করতে ওঠেন, তখন কোনো বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেনি। বিশপ বক্তৃতা দিয়েছেন, হাক্সলি বক্তৃতা দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে চমৎকার ভাববিনিময় হয়েছে। এর মধ্যে বিশপের চমৎকার বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করেছে; কিন্তু তিনি মানুষের পূর্বপুষ বিচার করতে গিয়ে নরবানরদের টেনে এনে প্রায় একটি অশালীন মন্তব্য করে বসেন। তাতে উপস্থিত সকলে অসন্তুষ্ট হন। এর উত্তরে হাক্সলি কী মন্তব্য করেছিলেন, তা ঠিকমতো শোনা বা বোঝা যায়নি। কারণ তখন হলের মধ্যে খুব চিৎকার হচ্ছিল। তবু এই ধরনের বাদ - প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে আলেচনাসভা চলতে থাকে এবং সবশেষ মন্তব্য করতে ওঠেন হুকার এবং তারপর আলোচনাসভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আলোচনাসভার পরের দিন হুকার, ডারউইনকে চিঠিতে এইরকম একটি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, “বিশপের এইরম আচরণ দেখে আমার দেহের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছিল, তখন খুব হীনমন্যতায় ভুগছিলাম; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম এবার একটু সুযোগ পেয়েছি। তখনই প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, এ ব্যাটাকে এমন ঘা দেব যাতে ও আর কোনোদিন এইসব বিষয় নিয়ে কোথাও কোনো কথা বলতে না পারে। তাই সেই গোলমালের মধ্যে আমি উঠে টেবিল থাপড়ে সবাইকে থামালাম।

“আমি ওকে তাক করে জোর গলায় দুটি কথা বললাম, (১) সে আপনার অভিব্যক্তির ওপর লেখা কোনো বই না পড়ে আপনারসম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করছে। আর (২) সে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে না। এরপরে আমি অ াপনার অভিব্যক্তির তত্ত্বের স্বপক্ষে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। দেখি বিশপের মুখে রা - টি নেই, সে চুপ করে বসে আছে। শ্রোতারাও চুপ করে আমারকথা শুনল। তারপর আমি যখন বললাম আলোচনা শেষ তখন সবাই আপনার নামে তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল।”

এই চিঠির উত্তরে ডার উইন হুকারকে লিখছেন, “আপনার ভালোবাসার তুলনায় এই জগতে অর্থ, মান, প্রতিপত্তি, ভে াগসুখ ইত্যাদি যেন জঞ্জাল মনে হয়।”

এই আলোচনাসভা যে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে তখন হাক্সলির বয়স অনেক কম এবং জনসমক্ষে এমন বক্তৃতা দেবার অভ্য াসও তাঁর তেমন গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ তখনও তিনি ডারউইনের বুলডগ হয়ে ওঠেননি। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন, “অ াসলে এই আলোচনাসভায় উপস্থিত থাকার মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। ভেবেছিলাম, কী দরকার খামোকা নিজের বা অপরের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করা। কিন্তু আলোচনাসভার শেষে নিঃশব্দে হুকার আর আমি পাশাপাশি হাঁটতে হঁ াটতে হুকারকে বলেই ফেললাম, এই ঘটনায় আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। বিশপকে দেখে আমি শিখলাম, সাধারণ ম ানুষের ভালোলাগার মতো করে কথা বলতে পারা কত কঠিন কাজ, অথচতা কতখানি গুত্বপূর্ণ। পূর্বে আমি এই বিষয়টিকে খুব নিচু চোখে দেখতাম; কিন্তু এখন বুঝছি এই বিষয়টি আমাকে ভালোভাবে, যত্ন করে চর্চা করতে হবে, অ ায়ত্ত করতে হবে।”

হিপোক্যাম্পাস বিতর্ক

ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠশারীরসংস্থানবিদ্ ও জীবাশ্মবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েনের (১৮০৪ - ১৮৯২) সঙ্গে হাক্সলির এই বিষয়ে বিতর্ক শু হয় অরিজিন ... বেবার (১৮৫৯) দু’বছর আগেই। অর্থাৎ ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব’ -এর সঙ্গে এই বিতর্কের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই উপলক্ষ হল, ওয়েন শিম্পাঞ্জিদের ওপর একটি বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নরবানরদের মস্তিষ্কে, মানুষের মস্তিষ্কের তিনটি অঞ্চল নেই, যার প্রধান অংশটি হল হিপোক্যাম্পাস। এর দ্বারা ওয়েন প্রম

াণ করতে চেয়েছেন, মানুষ ও নরবানরদের শারীরসংস্থানে গুণগত প্রভেদ রয়েছে। অর্থাৎ এর থেকে সহজভাবে প্রমান করা যায় যে অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষ পৃথক এবং আ রা বিশেষভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি।

আবার ঠিক ঐ সময়ই হাক্সলি বই লিখেছেন Man's Place in Nature। তাতে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে জীবের অভিব্যক্তির প্রবাহী প্রক্রিয়ায়। এই অভিব্যক্তির পক্রিয়ায় নরবানররা হল মানুষের পূর্বপুষ এবং অ ায়তনে ছোট হলেও নরবানরদের এমনকি বানরদের মস্তিষ্কেও হিপোক্যাম্পাস আছে। প্রসঙ্গত এই বিষয়টি নিয়ে লন্ডনে শ্র মজীবীদের সভায় ১৮৬০ - ১৮৬২ সালে হাক্সলি পর্যায়ক্রমে লেকচার দিয়েছেন এবং এর লেকচারে স্বয়ং মার্কস শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এখানে দুটি বিষয় আমাদের জেনে নিতে হবে, প্রথমত হিপোক্যাম্পাস বস্তুটি কী এবং ওয়েনের সঙ্গে হাক্সলির সম্পর্ক কেমন ছিল। পূর্বে উল্লিখিত, হাক্সলির সঙ্গে বিশপের বিতর্কের বিষয়ে অনুমান করা হয়, গোপনে বিশপকে লিখিয়ে - পড়িয়ে দেওয়ার কাজটি ওয়েন করেছিলেন। আর শুতে বন্ধুত্ব থাকলেও অরিজিন ... বেবার পর গোপনে ওয়েন, ড ারউইনের প্রায় শত্রু হয়ে ওঠেন। সুতরাং এয়েনের সঙ্গে ডারউইন, হাক্সলির সম্পর্ক কেমন ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

ওয়েন, হাক্সলির (বয়সে হাক্সলি ওয়েনের থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট) মতোই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; কিন্তু জ্ঞ ানী, শিক্ষিত এবং সুযোগসন্ধানী। প্রসঙ্গত 'ডায়নোসর' নামটি তাঁরই দেওয়া এবং 'হোমলজি' (বাদুড়ের পাখা ও ঘোড়ার পায়ের অঙ্গসংস্থানগত সাদৃশ্য) বিষয়টি তিনিই আবিষ্কার করেন। অন্য আর পাঁচজন ভিক্টোরিযান যুগের মানুষের মতো ওয়েন রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, বর্ণবিদ্বেষী। রামী কাছাকাছি যাতায়াতের সুবাদে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হনএবং নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নেন। এই কারণে অনেকে তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিলেন। তবে সন্দেহ নেই, তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবংঅনুজদের প্রতি নিষ্ঠুর। কিন্তু ক্ষমতাশালী মানুষজনের আশেপাশে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। ছাত্রাবস্থায় হাক্সলির জলপান আটকেগিয়েছিল, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ওয়েনের সুপারিশ বা পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তিনি তা করেননি। এই কারণে হাক্সলির রাগ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু স ামগ্রিকভাবে ওয়েনের জটিল, ক্ষুদ্র মনের জন্য তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন।

গু ও লঘুমস্তিষ্কের মধ্যবর্তী একটি অংশকে লাতিনে বলা হয় hippocampus,ইংরাজীতে Seahorse, আমরা বলি সিন্দুঘোটক। এটি ক্ষণস্থায়ী স্মৃতির জন্য আবশ্যকীয় এবং স্থায়ী স্মৃতির জন্য এখান থেকে পর্যায়ক্রমে স্মৃতিভাণ্ডার অগ্রলতির অগ্রভাগে স্থানান্তরিত হয়। হিপোক্যাম্পাস কার মস্তিষ্কে কতখানি আছে এটি জানার জন্য ওয়েনের অনেক বেশি সুযোগ ছিল। কারণ তিনি পেশায় ছিলেন শবব্যবচেছদবিদ্। তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যখন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে গো রিলা, শিম্পাঞ্জির সংরক্ষিত নমুনা আসতেশু করে তখন থেকেই ওয়েনের মাথায় এসেছিল যে এই বিষয় নিয়ে তিনি একটি বই লিখবেন।

কিন্তু হাক্সলিও হার মানেননি। ওয়েনের ঐ লেখার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বহু পরিশ্রমে, প্রধানত তাঁর বন্ধুদের সহযোগিতায় বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় তাঁর ভাবনাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নানা জাতিয় বানর থেকে শু করে মানুষের মরদেহ অব্দি অসংখ্য শবব্যবচেছদে মস্তিষ্কের সমস্ত অংশের মাপজোক করে ওয়েনের প্রায় দশ বছরের মাথায় ধরাশায়ী করে হাক্সলিকে কটাক্ষ করে, পরিবর্তে ওয়েনের অল্প হলেও জয়গান করে।

আসলে হাক্সলির বক্তব্য ছিল, অন্য বানর বা নরবানরদের তুলনায় মানবমস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতার যে পার্থক্য তা পরিমাণ দিয়ে বিচার করা যায় না, ক্রিয়াশীলতা দিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে পার্থক্য গুণগত এবং পরিমাণগত য া-ই হোক না কেন তা রয়েছে এবং তা এতই বেশি যে স্বয়ং হাক্সলির কাছেও এটি অস্বস্তির কারণ ফলে নরবানর ও ম ানুষের এই পর্যায়টির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলেও অনেকের এ বিষয়ে অস্বস্তি ছিল। এখানে হাক্সলি তাঁর শত্রুকে প্রায় পরাজিত করে ফেলেছেন, তাই সম্পূর্ণভাবে পরাভূত্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি বিজ্ঞানের বিচারে (এবং সামা জিক বিচারে) একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলেন।

বানর থেকে মানুষের এই ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিবর্তনের সাক্ষ্য বা উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন এবং লেখেন যে শ্বেতকায়দের পৃথিবীতে আসার পূর্বে মধ্যবর্তী 'মিসিং লিঙ্ক' হল কালো চামড়ার মানুষেরা। স্বভাবতই হাক্সলি এইরকম যুক্তি

দিচ্ছেন এটা জানার পর, ওয়েন নিজে বর্ণবিদ্বেষী হয়েও, হাক্সলির বিদ্ধে এবার পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেয়ে তা ব্যবহার করেন এবং বিজ্ঞানের সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে জয়লাভ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা হোমো - সেপিয়েন্স এবং তাদের কারো মস্তিষ্কে কোনো তফাতনেই।

বাস্তবিক গত এক লক্ষ বছরে হোম - সেপিয়েন্সদের দেহের সামন্যতম পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন যা আমরা দেখতে পাই তার জন্য দায়ী কালচার, জীবনচর্চা। তাই এই কারণেই আমরা দেখি, সেই সময়ের প্রাধান্যকারী চিন্তাভাবনা বা কালচার হাক্সলির মত খাঁটি মানুষদেরও বিগড়ে দিতে পেরেছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com